জার্মানির জীবন সৈকতে

চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

'তোমার আমাদের দেশে বেশ ভালো লেগেছে তো? তোমার মনে হয় শরীরে একটু সমস্যা হয়েছিল। আসলে আমাদের 'ক্লিমা'টা তো সুবিধের নয়—।' সিক্সথ স্ট্যান্ডার্ডের সোনয়া গেগেনওয়াট লিখেছিল তার বান্ধবী অর্থাৎ আমার মেয়েকে, তার আধো জার্মান আধো ইংরেজি ভাষার চিঠিতে, মিউনিখ থেকে। সেই এক-ই কথার প্রতিধ্বনি হয়েছিল আমাদের নোবেলজয়ী বন্ধু উলফগ্যাঙ্গ কেটারলের আমাকে পাঠানো ই-মেলে--'তোমার রাইন ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। আমি জানি আমার দেশ খুব-ই সুন্দর—।' সেই স্বদেশের গরবে গরবী আত্মাভিমানী জার্মানদের নিয়ে দু-কলম লেখার সাধ ঠিক ছাড়তে পারলাম না। ইংরেজিতে তো এদেশ নিয়ে অনেক বই-ই বেরিয়েছে। তাই ভাবলাম বাংলায় লিখব। অসাধারণ দেশ ও অসাধারণ জাতির কথা যদি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি! সেই আশা নিয়েই তরী ভাসিয়েছিলাম অজানার উদ্দেশে।

আমার অন্তরে এ বই লেখার সাধ জাগার অবশ্য আরো একটা কারণ ছিল। অদেখা বিধির লিখনের টানে বিদেশ আমি বহুবার গেছি। দেখেছি অনেক দেশ। কিন্তু আমার প্রথম বিদেশ-যাত্রা জার্মানি । শেকসপীরীয় প্রেম-নীতিতে 'লাভ এ্যাট ফার্স্ট সাইট' বা প্রথম দর্শনে প্রেম আর কি! কিন্তু শুধু তাই নয়। ভবিতব্য সেখানে আমাকে বারে বারে নিয়ে গেছে। প্রথম দেখেছিলাম সে-ই বিশ বছর আগে, যখন তারা বার্লিনের 'লজ্জার প্রাচীর'কে নির্মমভাবে ভেঙেছিল। আর আবার দেখলাম এই ২০০৯ এর শুভলগ্নে—যখন সেরা দেশের উষ্ণীষ তার শিরে। যখন বার্লিন প্রাচীর স্খলনের বিশ বছর পূর্তির আনন্দ-উৎসবে মেতেছে তারা। আজ তাদের রাজধানী নগরীর পথে সাজ সাজ রব। তাদের এই বার্লিনার মাওয়ার (প্রাচীর) উৎসব তখন সবে শুরু হয়েছে। চলবে দীর্ঘ এক বছর ধরে।

এভাবে বহুবার জার্মানিতে যাওয়ার ফলে দেখেছি তার অসংখ্য জায়গা। অবশ্য এ কৃতিত্বের আংশিক অংশীদার-ই আমি। এর বেশিটাই সেই বিশাল সংগঠনের যার নাম আলেকজান্ডার ভন হুমবোল্ট ফাউন্ডেশান। উচ্চস্তরীয় গবেষণার জন্য জার্মানির এ সংস্থা প্রচুর বৃত্তি দেয়। আমার স্বামী বিজ্ঞানী ও হুমবোল্ট ফেলো। সেই হুমবোল্টের ব্যবস্থা করা অসাধারণ ট্রিপে ঘুরেছি এমন কিছু জায়গা যা অন্যথা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক উত্থান পতনের

কেন্দ্রবিন্দু এই অদ্ভুত ও অসামান্য দেশকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি হুমবোল্ট ফাউন্ডেশানের কাছে চির-কৃতজ্ঞ।

আমার দেখা সেই নিপুণ সুসংগঠিত দেশের কথাই আছে এই বইতে। রয়েছে সেই কভু হার না মানা বীর জাতির কথা, বহু শক্তি যাদের বার বার গুঁড়িয়ে দিয়েও মাটিতে মেশাতে পারেনি। সেই কর্মঠ আত্মাভিমানী জাতিকে কতটা বুঝতে পেরেছি জানিনা, তবে একথা ঠিক যে তাদের দেশে-শহরে, তাদের হাতে সাজানো প্রকৃতিতে, তাদের তৈরি শিল্প-নৈপুণ্যের মাঝে, তাদের গড়া নিখুঁত বিদ্যাশ্রমে ও আমার কিছু বিজ্ঞানী বন্ধুদের অমলিন সাহচর্যের মাঝে সব সময় খুঁজেছি তাদের। বার করতে চেয়েছি জার্মানদের ভিতরের সেই অদেখা পরশপাথরকে, যার পরশে প্রতিবার-ই তারা তাদের ধুলার দেবতাকে তুলে স্বর্ণপ্রতিমায় বদলে দিয়েছে। সাফল্যের সেই অমোঘ চাবিকাঠির রহস্য কী? তার-ই বিস্ময় আমায় আকুল করেছে। ভালোবাসতে বাধ্য করেছে জার্মানিকে।

বারে বারে জার্মানি গিয়ে তার এক বিরাট অংশকে ঘুরে দেখেছি। মুগ্ধ করেছে তার হিরোইক রাইন উপত্যকা, তুষারে ঢাকা আল্পসের সারি, ব্ল্যাক ফরেস্টের কালো ঘন আঁধারের শিরশিরে রোমাঞ্চ ও নেকার তীরের পাহাড়ির গায়ের সুরকীলাল হাইডেলবার্গ কেল্লা। বুক কেঁপেছে হিটলারের ডাকহাউ কনসানট্রেসান ক্যাম্পের ভয়াবহ আঙ্গিনা দেখে। আবেগপ্রবণ করেছে তার ঐতিহাসিক উত্থান পতনের ঝঞ্ঝায় গাঁথা বার্লিন নগরী তো বিস্মিত করেছে তার প্রকৃতিঘেরা শিল্প বিপ্লবের জয়ধ্বজা। প্রায় এক শতক নোবেলজয়ী ও বহু নোবেলোত্তর বিজ্ঞানীদের জন্ম দিয়েছে যে মাটি তার গবেষণার আঙ্গিনা মনকে বিকল করেছে। ইতিহাসকে ধরে রেখে বিদ্যা, শিক্ষা ও আধুনিকতার উষ্ণীষ পড়েছে যে দেশ তার-ই নাম জার্মানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করালগ্রাস থেকে উঠে দাঁড়ানো সেই চির উন্নত শিরের দেশকে আমি তার-ই আলোকে দেখাতে চেয়েছি। দেখাতে চেয়েছি দীর্ঘ বিশ বছরের পটভূমিকায় তার কিছু পরিবর্তনকে। সেই অর্থে এ বই ঠিক ভ্রমণ নয়। বইয়ের মূল ধারা ভ্রমণকে ভিত্তি করে এগোলেও তাকে অনবরত পুষ্ট করে গেছে ইতিহাস, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও সেখানের জার্মানদের, বিশেষকরে প্রফেসার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমার গল্প-কথার বহু টুকরো আলাপন। আমার একান্ত ইচ্ছা সবাই জার্মানিকে জানুক। জানুক সেই অপ্রতিহত জার্মান জাতিকে, যাদের কর্মনিষ্ঠতা, একাগ্রতা ও দেশপ্রেম-ই তাদের জীবন-মোক্ষের সূত্র। সততা ও একনিষ্ঠতার জীবন-মন্ত্রে দীক্ষিত তারা।

সূচিপত্র

ইতিহাসের গল্প কথায়	২৭
গ্যেটের প্রিয় রোমান্টিক শহরে	৩৫
ব্ল্যাক ফরেস্টের বন্য প্রান্তরে	৫৯
যেখানে নাবিকেরা নোঙর ফেলে	৭৩
হ্যারি পটারের জাদুর দেশে	৯১
পরীর দেশের দুর্গ রাজ্যে	১২৪
ক্যাথোলিকদের পবিত্র নগরীতে	১৪১
উষ্ণীষ যার শিরে	১৬৬

ইতিহাসের গল্প-কথায়

জার্মানি এমন এক দেশ যে সৃষ্টির ইতিহাসে চিরদিন পেয়েছে শিখরের মর্যাদা। তা সে যুদ্ধের ময়দান-ই হোক বা উন্নতির সোপান—ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে থেকেছে শুধু একটাই নাম, 'জার্মানি'। অতি ক্ষুদ্র, হয়ত আমাদের একটা ছোটো রাজ্যের মতো হবে, কিন্তু আকর্ষণীয়। আকর্ষণীয় সে তার ক্ষমতার জন্য। অসংখ্য প্রতিকূলতা ও বড়ো বড়ো রাজনৈতিক শক্তির থাবার নীচে পিষে ফেলার প্রচেষ্টার মধ্যেও সে বিশ্বজয়ী। নানান ঘৃণ্য চক্রান্তের মাঝেও প্রায় আশির ওপর নোবেলজয়ী এসেছেন শুধু জার্মানি থেকে। বিজ্ঞানের জয়ধ্বজা পোঁতা তার বুকে। গবেষণার বিজয়টিকা তার ললাটে। গবেষণার মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে জন্ম নেয় তার বংশধর। তাই এই বিজ্ঞানের যুগে সে চির গবেষণাপ্রবণ, নির্ভীক, চিন্তনশীল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বিশ্বের দরবারে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়াই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই জার্মান জাতির ক্রমান্বয়িক অথচ সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের কথাই রয়েছে এখানে। বইয়ের প্রাসঙ্গিকতার কথা স্মরণে রেখে পুরাকালের তুলনায় আধুনিক যুগের ইতিহাসের ওপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। সেই ব্যাখ্যা আজকের জার্মানিকে বুঝতে সাহায্য করবে।

ইতিহাসকে টেনে নিয়ে যাই এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে, যখন উত্তর ইউরোপের দিক থেকে বহু বর্বর যোদ্ধারা এসে ঢোকে এখনকার জার্মানিতে। তারা দানা বাঁধে দক্ষিণ রাইন ও ড্যান্যুবের তীরে। রোমানরা এই অপরাজেয় জাতির গোষ্ঠীকে জার্মানি ও তাদের বাসভূমিকে জার্মানিয়া নামে সম্বোধন করে।

বিশ্বজয়ী রোমানরা তাদের দমন করতে চাইলে প্রতিহত হয় ও পরে রোমান শক্তির স্খলনে জার্মানরা আরো বড়ো অংশ অধিকার করে বসে।

তারপরের কিছু উত্থান পতনের সঙ্গে আসে চার্লিম্যাগনের রাজত্বকাল। ৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই ফ্রাংকিশ শাসকের সময় থেকেই জার্মানির নীবপত্তনের কাল ধার্য করা হয়। রাজধানী তৈরি হয় আখেনে। প্রথম অটো দি গ্রেটের যুদ্ধের কালে বিতাড়িত হয় হাঙ্গেরিয়ানরা। চার্লিম্যাগনে তার রাজত্বকে এলব নদীকে ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার করে। ফলে ৮০০ সালে রোমের রাজসমারোহে সে সম্রাট ঘোষিত হয়। তারপর বেশ কিছু বছরের লম্বা বিরতির পর ১২৭৩ সালে হ্যাপসবার্গ রাজতন্ত্রের রুডলফ প্রথম আবার সম্রাট নিযুক্ত হন। তিনি ভিয়েনাকে অধিকার করে তাকে রাজধানী করলে ভিয়েনা স্থাপত্যে সৌন্দর্যে ঝলমল করে ওঠে। সেই জার্মান রাজার আধিপত্যের জন্য আজও অস্ট্রিয়াতে জার্মান ভাষার প্রচলন লক্ষ করা যায়।

রোমান সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বন, কোলন, রিজেনসবার্গ, ট্রিয়র ও ভিয়েনার মতন কিছু ঐতিহ্যপূর্ণ নগরী—রাইন ও ড্যান্যুবের তীরে। রোমের পতনে তারা অধিকাংশই বিনষ্ট হল। আবার কালের প্রবাহে তৈরি হল নতুন কিছু নগরী, আর কিছু প্রাচীন নগরীও নতুন জীবন পেল। এমন সময় বাইরের শত্রুদের থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য রাজারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কিছু প্রতিরক্ষাবাহিনী তৈরি করতে আরম্ভ করল। এদের মধ্যে ১২০০ সালের শেষের দিকে হ্যানসিয়াটিক লিগ সবচেয়ে শক্তিশালী দল গঠন করে, যাদের দলভুক্ত ছিল কোলন, ডোর্টমুন্ড, ব্রেমেন, হ্যামবুর্গ ও লুবেক।

এরপর ১৫১৭ সালে আরম্ভ হয় জার্মান সাধক মার্টিন লুথারের আন্দোলন। এই ঐতিহাসিক সময়টাকে আধুনিক যুগের নীবপত্তন বলে। সেই সময়কে ভিত্তি করে নবজাগরণ ঘটে। প্রচুর নতুন আবিষ্কার হয় জার্মানির মাটিতে। লুথার রোমান ক্যাথোলিক চার্চের ভিতরকার ক্লিষ্ট মনোভাবগুলোর তীব্র নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাঁর এই পরিবর্তনশীল মনোভাবকে সমর্থন করে অনেকে। তাঁরা প্রোটেস্ট করেছেন বলে এই ভিন্ন প্রতিবাদী দলের নাম হয় প্রোটেস্টেন্ট। এদিকে শক্তিশালী চার্চ সহজে তার অধিকার ছেড়ে দিতে চায় না। ফলে লুথারের এই শোধনমূলক আন্দোলনকে ঘিরে বহু উত্থান পতনের খেলা চলে। ১৬০০ সালে জার্মানি, বিভিন্ন বিপক্ষী রাজাদের মধ্যে টুকরো টুকরোভাবে বিভাজিত হয়। ১৬১৮ সালে বোহেমিয়ায় এক প্রোটেস্টেন্ট বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে কিছু যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়, যা প্রায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত চলে।

ইতিমধ্যে তৈরি হয় আরেক নতুন শক্তিশালী দেশ, প্রুসিয়া। ১৬৩০ দশকে

হোহেনজোলার্ন নামের এক পরিবার পূর্ব জার্মানির দিকে তার শক্তির বিকাশ ঘটাতে থাকে। ব্র্যান্ডানবুর্গ রাজ্যে রাজত্ব করাকালীন বার্লিন ছিল তাদের রাজধানী। ১৬১৮ সালে তারা প্রুসিয়ায় দখল বসায়। বংশানুক্রমে তারা আরো শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায় ও হোহেনজোলার্ন নিজ রক্ষার্থে এক বড়ো সৈন্যদল গঠন করে। সেই সময় কৃষি শিল্প আর মানুষের জীবনের মান উন্নত হয়।

এ হেন পরিস্থিতির মধ্যে আরম্ভ হয় ফরাসি আন্দোলন, কিন্তু সে আন্দোলন প্রথমে কনসারভেটিভ জার্মানিকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে না। অথচ ফরাসিদের ক্রমান্বয়িক যুদ্ধে জার্মানি আহত হয়। এমনকি তার কিছু অংশ চলে যায় নেপোলিয়ানের কবলে। পরে যুদ্ধমুখর ইউরোপকে শান্ত করতে ১৮১৪-র শেষ থেকে ১৮১৫-র প্রথমের দিকের সময়ের মধ্যে বিজয়ী দেশেরা মিলিত হয় ভিয়েনা শহরে। এই কংগ্রেস অফ ভিয়েনা জার্মানির ৩৯টি রাজ্যকে সংঘবধ্ব করে তার নাম রাখে 'বুন্ডেসটাগ'। চারটি স্বশাসিত শহরকে বাদ দিলে জার্মানির প্রায় প্রতিটা শহরেই ছিল রাজতন্ত্র। এই আঠারো শতাব্দীর শেষের দিকেই জার্মানিতে সাহিত্যরসের জোয়ার আসে। আসে রোমান্টিক যুগ আর উন্নতমানের দর্শন। গ্যেটে, শিলার এবং অন্যান্যরা তারই ফসল।

জীবনের সাধারণ নিয়মকে মেনেই এগোয় সমস্ত কিছু আর সেই নিয়ম অনুযায়ী উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর আগে প্রতিটা দেশকেই পেরোতে হয় তার কিছু নির্ধারিত ধাপ। জার্মানির ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। ১৮০০-র সময় তারও আর্থিক উন্নতির তুলনায় বেড়েছে জনসংখ্যার হার। এমন পরিস্থিতিতে অভাব দেখা দিয়েছে তার দুয়ারে। মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আরো উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষায়।

কিন্তু অভাববোধে পড়ে থাকার মানুষ তারা নয়, তাই জার্মানির মাটিতে আরম্ভ হয় বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ আসে ১৮৪৮ সালে, প্যারিস থেকে। আগুন ছড়ায় প্রতিটা জার্মান নগরীতে। ফলে মে মাসে ফ্রাঙ্কফুর্টে এক নির্বাচক মণ্ডলীর সাহায্যে নতুন সংবিধান গঠিত হয়। এইভাবে জার্মানি ও তার আশেপাশের দেশগুলোর মধ্যে শক্তি বৃদ্ধি ও হ্রাসের টানাপোড়েনের যুদ্ধ চলতে থাকে। এমন সময় প্রুসিয়ার রাজা উইলহেম প্রথম, অটো ভন বিসমার্ককে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। বিসমার্ক সাংবিধানিক গোলযোগ মেটাতে ও প্রুসিয়াকে জার্মানির ডান হাত হিসেবে তৈরি করতে তৎপর হয়ে পড়েন।

বুদ্ধিমান বিসমার্কের তত্ত্বাবধানে জার্মানি তার প্রতিবেশী দেশদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়। সাত সপ্তাহের যুদ্ধে জার্মানি অস্ট্রিয়ার

ওপর অধিকার বিস্তার করে। আবার ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধে দখল করে ফরাসিদের দেশ ও প্যারিস।

বিসমার্কের প্রচেষ্টায় একটা সুন্দর সরকার গঠিত হয়। রাজাকে যথাযথ পদ-মর্যাদা দিয়ে তিনি জনতা ও রাজ্য সরকারের মতে এক বিশেষ ধরনের গণতান্ত্রিক দেশ গঠন করতে চান। ২৫ বছরের ঊর্ধ্বে সবাই ভোট দেবার অধিকার পায়। এ ব্যাপারে বিসমার্ক সবার সমর্থন পেলেও রোমান ক্যাথোলিক ও সোসালিস্টদের অনুমোদন পান না। ১৮৭১ সালের পর বিসমার্ক তাঁর সংগঠিত জার্মানিকে উন্নত করার জন্য অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তা কার্যকরী হয় না। বিসমার্ক জার্মানির নিরাপত্তাকে দৃঢ় করতে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও ইটালির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ট্রিপল এ্যালায়েন্স তৈরি করেন। কিন্তু উইলহেম প্রথমের মৃত্যু হলে তাঁর নাতি উইলহেম দ্বিতীয়ের রাজত্বে বিসমার্ক বিতাড়িত হন। সংযুক্ত জার্মানির ক্ষমতা ও উইলহেম দ্বিতীয়ের খামখেয়ালিপনায় ভীত হয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশরাও একজোট হয়ে ট্রিপল এনটিটি তৈরি করে। ফলে সমস্ত ইউরোপ দুটো মিলিটারি শক্তিতে বিভাজিত হয়ে যায়।

১৯১৪ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরির রাজকুমার ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যান্ড ও তার স্ত্রীর হত্যাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। ক্রমে জার্মানির বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ব একত্রিত হয় এলাইড শক্তিরূপে। দেশভক্ত জার্মানরা তাদের প্রাণপ্রিয় ফাদারল্যান্ডকে বাঁচাতে দলে দলে এ যুদ্ধে সামিল হয় ও প্রাণ হারায়। তাই প্রথমে জার্মানি এ যুদ্ধ জিতলেও, তাতে বহু জার্মানের জীবনাবসান ঘটে। জার্মানির পুরুষ জনসংখ্যার হার খর্ব হয় ও জার্মান সৈন্যদলে টান পড়ে। তার সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। ১১ নভেম্বর ১৯১৮তে জার্মান আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বযুদ্ধের পর ট্রিটি অফ ভারসাইয়ের রাজনৈতিক চুক্তিতে জার্মানির সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়ে তাকে নিস্তেজ ও অক্ষম করে দেওয়া হয়।

কিন্তু বিচক্ষণ জার্মানরা আত্মসমর্পণের আগেই এই বিনাশকারী যুদ্ধের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। কীলের এই বিদ্রোহ তড়িৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে শহরান্তরে। ভীত সম্রাট উইলহেম দ্বিতীয় নেদারল্যান্ডে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচায়। ৯ নভেম্বর ১৯১৮তে জার্মানি গণতান্ত্রিক দেশের স্বীকৃতি লাভ করে। মেয়েরাও প্রথম ভোট দেবার অধিকার পায়। ওয়াইমারে নতুন নির্বাচিত সভার মাধ্যমে সংবিধান তৈরি হলে গণতন্ত্রের নাম রাখা হয় 'দি ওয়াইমার রিপাবলিক'।

এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ওয়াইমার রিপাবলিক তার যথাযথ মর্যাদা পায় না। কিছু জ্ঞানী গুণী মানুষরা তখনও সম্রাটের সাম্রাজ্যনীতিকেই মান্য করে চলেন। জার্মান

আর্মি পরাজয়ের জন্য জার্মান বিদ্রোহীদের-ই দোষী বলে বিবেচিত করে। আবার ভারসাই চুক্তির চাপেও তাদের শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হয়।

এ হেন পরিস্থিতিতে ১৯২২ ও ১৯২৩ সালে জার্মানির সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক পতন ঘটে। জার্মান মুদ্রা মূল্যহীন হয়ে যায়। জার্মানরা বাড়িতে কাগজের বদলে গুচ্ছ গুচ্ছ নোট দিয়ে আগুন জ্বালায়। পরে গুস্টাভ স্ট্রেসেম্যান নতুন চান্সলারের পদে নিযুক্ত হলে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ১৯২৯ সালে আবার বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক স্খলন হলে জার্মানি নতুন করে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বহু মানুষের চাকরি যায়। বাড়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস। নামে এক গণতান্ত্রিক সরকার থাকলেও মানুষের বিশ্বাসের অভাবে তা সম্পূর্ণরূপে কার্যহীন হয়ে পড়ে।

বিরূপ পরিস্থিতিকে কাজে লাগায় হিটলার। তার নাজি পার্টির বিদ্রোহ অসফল হলে সে তার বক্তৃতার মাধ্যমে জার্মানদের মন জয় করে। অপরাজেয় আত্মাভিমানী জার্মান জাতির হৃদয়কে বিদ্রোহী করে তোলে নিকৃষ্ট ভারসাই চুক্তি ও তখনকার অভাবগ্রস্ত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে। এ হেন স্পর্শকাতর সময়ে সে তখনকার জার্মান রাষ্ট্রপতি হিনডেনবার্গের হাতে চান্সলার নিযুক্ত হয়। এবার হিটলার তার স্বরূপ ধারণ করে। সমস্ত দলকে বরখাস্ত করে শুধু নাজিকে একমাত্র দলরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সংবিধানকে নষ্ট করে দেশের কোর্ট, কাগজ, স্কুল, পুলিস ইত্যাদির ওপর একছত্র অধিকার কায়েম করে রাতারাতি সম্পূর্ণ ডিকটেটর হয়ে দাঁড়ায়। তার এই বিধ্বংসকারী নতুন রাজত্বের নাম দেওয়া হয় 'দি থার্ড রাইক'।

হিটলারের নাজিধারা কেউ বুঝুক না বুঝুক, মনে মনে আসন্ন অশনির ভীতি আশঙ্কা করে বেশিরভাগ লোক চুপ থাকে। হিটলারের দুটো মূল উদ্দেশ্য ছিল—এক, জার্মানিকে উচ্চ শ্রেণির জার্মান ভিন্ন অন্যান্য নিম্ন শ্রেণি থেকে মুক্ত করা আর দুই, জার্মানিকে দৈর্ঘে প্রস্থে বাড়ানো, বিশেষকরে তার পূর্ব সীমান্তের দিকে। প্রথম উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করতে ও বিশেষ করে জার্মানিকে ইহুদিমুক্ত করতে, সে বিশেষভাবে লেগে পড়ে। বিভিন্ন ধরনের নির্মম পন্থাকে অবলম্বন করে সে ইহুদিদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে ফেলে, সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করে ও কনসানট্রেশ্যান ক্যাম্প ও অন্যান্য উদ্ভাবনী পন্থায় গণনিধন করতে আরম্ভ করে। অপরদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলে পূর্ণমাত্রায়। ইটালি ও জাপানের সঙ্গে চুক্তি করে সে এ্যাক্সিস পাওয়ার তৈরি করে। একে একে দখল করে অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়াকে। অবশেষ পোল্যান্ডের ওপর আক্রমণ করলে আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যান্ডকে সাহায্য করতে তৎপর হলে যুদ্ধের স্ফীতি বাড়তে